পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

পড়াশোনার বিকাশে লাইব্রেরির ভূমিকা

চুমকি দাস

পড়ার বই কত দরকারি, তা বুঝতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় না। জীবনে পার্থিব প্রতিষ্ঠা তৈরি করার জন্যে স্কুলের বই, পড়ার বই এসবের ভূমিকা কি আমাদের কারও অজানা? এটা মেনে নিতেও আমাদের কোনও বিরোধ নেই। সমস্যা হয় পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু পড়তে বললে। ভাবনা আসে, পড়ে লাভ কী? সময় নষ্ট। বদভ্যেস। পড়ার ক্ষতি। তাই নিজেরাই নিজেকে অথবা মা-বাবারা জোর করেই ছেলেমেয়েদের সরিয়ে রাখেন। তাই দিন দিন বই পড়া বা লাইব্রেরিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমছে। একটা সময়ে লাইব্রেরিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা বেশিই ছিল কারণ তখন বই ছিল জ্ঞানের অন্যতম মাধ্যম। যেখানে নিজে পছন্দ করে কোন বিষয়টা কীভাবে জানব তা খুঁজে নেওয়া যেত। আবার একসাথে প্রায় বিনা পয়সায় এত রকমের বই পড়ার সুযোগ শুধু লাইব্রেরি তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু ই-বই বা অনলাইন লাইব্রেরি আসায় ছাপা বইয়ের বাজার একটু কমেছে বই কি।

ছাপা বই বা ই-বই যাই হোক না কেন তাদের তুল্যমূল্য করে লড়াই করাটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। দরকার বই পড়ার অভ্যেসকে ফিরিয়ে আনার। স্কুল, প্রাইভেটে পড়ার চাপ, তার ওপরে অতিরিক্ত ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি তো আছেই। আর সবথেকে লোভনীয় বিষয় এখন নানা গ্যাজেট আর তাতে আবদ্ধ নানা গেম ও অ্যাপ। এই করেই দম ফেলার ফুরসত নেই। ফলে বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন এমন এক প্রজন্ম নাকি তৈরি হচ্ছে যা নাকি বেশিরভাগটাই মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হবে। বই না পড়লেই মানুষের এত ক্ষতি হতে পারে? ভাবতে অবাক লাগে বোধহয়। আসলে একটা বই কী? কিছু তথ্য, গল্প আর শব্দ। কিন্তু তাতে লুকিয়ে থাকে পরিবেশনযোগ্য সুন্দর ভাষা, সুন্দর ভাবনা। মানুষের কল্পনা, শুভ-অশুভের বিভেদ, সৃজনশীল মন, যুক্তি-বুদ্ধির বিস্তার, নানা অজানাকে জানার সুযোগ। কত জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় বই আর কত জিজ্ঞাসা তৈরিও করে। তাই বই পড়ার পরিধি যত বাড়ে তত বাড়ে জানার আর ভাবনা-চিন্তার পরিধি। লাইব্রেরি তৈরির মূলে ছিল এই জ্ঞানচর্চার বিস্তার। একটি মানুষের বই কেনার, তা রাখার সামর্থ্যের সীমা থাকতে পারে। কিন্তু তার জানার ইচ্ছায় বাধা যাতে না পড়ে তাই লাইব্রেরি তৈরির ভাবনা মানুষের মাথায় এসেছে।

ল্যাটিন 'লিবার' শব্দের অর্থ বই বা পুস্তক। সেখান থেকেই লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি। ছাপাখানা আবিষ্কারের পরেই বই প্রকাশনা যখন অনেক সহজ হয়ে আসে তখন বই লেখা বা পড়া এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার ইচ্ছে আরও জোরদার হয়। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের ঘটনা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।

এরপর সাতের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
বিশেষ প্রবন্ধ
ভাষাবিজ্ঞান ও এর উৎস
তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস এইট-এর টিউশন
বিজ্ঞান
চারের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ইতিহাস
পাঁচের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
বাংলা ব্যাকরণ
ইংলিশ গ্রামার
ছয়ের পাতায়
এডু টিপস ও ক্যুইজ
সাতের পাতায়
জেনারেল নলেজ
বাংলার লেখিকা
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
গ্রহকথা

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

রেফারেন্স বই পড়া দরকার

মৃন্ময়ী বিশ্বাস শিক্ষিকা, বামনমুড়া কুসুমকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়

এখন ক্লাস এইট অবধি পরীক্ষা উঠে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়াশোনার গুরুত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছে। লক্ষ্যহীনতায় ভুগছে। এর ফলে ক্লাস নাইনে এসে তারা হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় তাই পড়াশোনা নিয়মিত করতে হবে। রোজ স্কুলে যাওয়ার অভ্যেস করতে হবে। স্কুলের টাস্ক নিয়মিত করতে হবে। শুধু কোচিংনির্ভর হলে ক্ষতি হবে।

এখন স্কুলে টিচার ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত যা, তাতে সব স্কুলেই ভালো পড়াশোনা হয়। মডেল আর অ্যাসাইনমেন্ট করে পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীরা তাতে মনোযোগ দিলে তারা আরও ভালো শিখতে পারবে।

টেক্সট বুক পড়া আবশ্যিক। আর একটি অন্তত রেফারেন্স বই পড়তেই হবে। পড়ার পরে লিখতে হবে। আর রোজকার পড়া রোজ করতে হবে। ক্লাসে যেদিন যে বিষয়টি পড়ানো হয় তা নিয়ে ৩৫/৪০ মিনিট আলোচনা হওয়ায় সেটি একরকম মাথায় ঢুকে যায়। এরপর সেদিনই অন্তত একবার পড়লেই বিষয়টা মাথায় গেঁথে যায়। এটাই দুদিন পরে পড়লে আর তত লাভ হয় না। প্রোজেক্টের প্রতিও তাদের আচরণ পাল্টাতে হবে। নিজে হাতে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

পড়াশোনায় বুদ্ধির বিকাশ হয়। তাই ফার্স্ট হওয়ার জন্যে নয়, জানার জন্যে লেখাপড়া করা দরকার। সবাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছক, এটাই আমরা চাই।

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

নতুন ক্লাস, পড়ার চাপ, সময় নষ্ট করছি না

পল্লবকান্তি নাথ নবম শ্রেণি, নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলচর

নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র পল্লবকান্তি নাথ। পল্লব এবার প্রথম স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে পড়াশোনার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা পল্লব ভালোভাবেই জানে। সদ্য নবম শ্রেণিতে ওঠা এই মেধাবী ছাত্র উত্তরণের মুখোমুখি হল।

উত্তরণ: ভালো রেজাল্ট করে নবম শ্রেণিতে উঠেছ। অনুভূতি কেমন হচ্ছে?

পল্লব: আমি খুব আনন্দিত। মনে মনে আমি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার স্বপ্নই দেখেছিলাম। আর স্বপ্ন যখন সত্যি হয় তখন আনন্দও অনেক হয়, আমারও তাই হয়েছে।

উত্তরণ: বছরের শুরুতেই পড়াশোনার গতি কেমন?

পল্লব: ভালোভাবেই স্কুলের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে এখন। এবারে নবম শ্রেণিতে উঠেছি। পড়ার চাপও অনেক। তাই সময় নষ্ট করছি না। কাজেই স্কুলে এখন যা পড়াচ্ছে তা সবই বাড়ি গিয়ে আরেকবার পড়ে নিচ্ছি।

উত্তরণ: সারাদিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করো?

পল্লব: সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রতিদিন একরকম থাকে না। আর সকালের পড়াও খুব বেশি হয় না। কারণ স্কুলে যাবার তাড়া থাকে। রাত্রিতে অনেক সময় পর্যন্ত পড়তে আমি ভালোবাসি। সব বিষয় আমি একসঙ্গে পড়ি না। সকালে শুধু ভালো ভাবে রিডিং করি কিছু কিছু বিষয়। রাত্রিতে যথেষ্ট সময় পাই সেগুলো শেখার জন্যে। ছুটির দিনে দুপুরে অঙ্ক করি এবং ইংলিশ গ্রামার প্র্যাকটিস করি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয়?

পল্লব: ইংরেজি।

উত্তরণ: বাড়িতে পড়াশোনায় অভিভাবকরা কীভাবে সহযোগিতা করেন?

পল্লব: ছোটবেলা থেকেই আমি মা-বাবার কাছে পড়েছি। তবে, এবার গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেব। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আমাকে খুব সহযোগিতা করেন পড়াশোনার ব্যাপারে।

উত্তরণ: তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?

পল্লব: আমি সমাজসেবা করতে চাই। গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। বিকলাঙ্গদের সাহায্য করতে চাই। নিজেকে যদি এই ধরনের কাজে নিয়োজিত করতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক মনে করব।

উত্তরণ: এই মহৎ কাজটা বড় কঠিন। তবে সদিচ্ছা থাকলে সাফল্য অনিবার্য। রইল শুভকামনা।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

কীভাবে শুরু হল দোল উৎসব?

অপর্ণা দেবনাথ

ধরায় লেগেছে বসন্তের ছোঁয়া। আকাশের গায়ে গায়ে পলাশ ছড়িয়েছে তার রাঙা সূর্যের মতো জীবনের রং। বসন্ত মানেই দোল উৎসব বা হোলি। নানান রীতিতে যুগ যুগ ধরে দেশের সর্বত্র এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। দোল বলতে আমরা যেটা বুঝি তা হল রঙের খেলা, একে অপরকে রঙে রাঙিয়ে দেওয়া। মুঠো মুঠো করে শুকনো ঝুরো আবিরের সঙ্গে পিচকিরি দিয়ে গুলোনো রঙের ছড়াছড়ি। এই উৎসবের আরেক নাম বসন্তোৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

এরপর পরের পাতায়

ভাষাবিজ্ঞান ও এর উৎস

বৃষ্টি ঘোষ

ভাষাবিজ্ঞান বলতে একটি সংশ্রয় (সিস্টেম) হিসাবে ভাষার প্রকৃতি, গঠন ঔপদানিক একক এবং এর যে কোনও ধরনের পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বোঝায়। যাঁরা এই বিষয়ে গবেষণা করেন তাঁদের বলা হয় ভাষাবিজ্ঞানী। কীভাবে সঠিকভাবে লিখতে বা পড়তে হয়, ভাষাবিজ্ঞানে তা নিয়ে গবেষণা করা হয় না। ভাষাবিজ্ঞান বিধানমূলক নয়, বরং বর্ণনামূলক। ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক সময় বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন যা মানুষকে ভাষা বিষয়ক কোনও সিদ্ধান্ত বা মূল্যায়নে সাহায্য করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বা মূল্যায়নগুলো ভাষিক বিজ্ঞানের অংশ নয়।

ভাষাবিজ্ঞানের উৎস

পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিকেরা প্রথম ভাষার তত্ত্বের ব্যাপারে আগ্রহী হন। ভাষার উৎস ও গ্রিক ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো ছিল তাঁদের মূল বিতর্কের বিষয়। পাতো ও আরিস্তোতল ভাষার অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ধারণা করা হয়, পাতো-ই প্রথম বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দিয়োনিসিয়ুস থ্রাক্স প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রিক ব্যাকরণ রচনা করেন। এই প্রভাবশালী ব্যাকরণটিকে পরবর্তীতে রোমীয় বা লাতিন ব্যাকরণবিদেরা মডেল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অনুরূপে তাঁদের কাজও পরবর্তীকালে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সময় লেখা সব ব্যাকরণকে প্রভাবিত করে। এ সময় ইউরোপে প্রচলিত বেশিরভাগ ভাষার ব্যাকরণবিদ গ্রিক ও লাতিন ব্যাকরণকে মান ও 'শুদ্ধ' ব্যাকরণ গণ্য করে তাঁদের নিজ নিজ ভাষার জন্য বিধানমূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদেরা বিশ্বের অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পাশ্চাত্যের বাইরে ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষা-বিষয়ক গবেষণার একটি স্বতন্ত্র ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে পার্থক্য করেন এবং গ্রিক ব্যাকরণবিদদের মত বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনুসর্গ ও অব্যয় নামের দুটি পদ আবিষ্কার করেন। ভারতীয় ব্যাকরণবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন পাণিনি (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী)। তবে তাঁর বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ভারতে ব্যাকরণচর্চা শুরু হয়েছিল। পাণিনি-পূর্ব ব্যাকরণবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন যাস্ক (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী)। যাস্ক তাঁর ব্যাকরণে বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাতের (অব্যয়) উল্লেখ করেছিলেন। তবে পাণিনির ব্যাকরণেই তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিকের চিন্তাধারা পূর্ণতা পায় এবং এটি ভবিষ্যতের সমস্ত ভারতীয় ব্যাকরণকে প্রভাবিত করে। তাঁর ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে কমপক্ষে ১২টি ভিন্ন ব্যাকরণ-তত্ত্বের ধারা ও হাজারখানেক ব্যাকরণ রচিত হয়। এই ব্যাকরণের মূল অংশে পায় চার হাজার সূত্র প্রদান করা হয়। শুধু ১৮ শতকের শেষার্ধে এসেই পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় ব্যাকরণের এই ধারার সাথে প্রথম পরিচয় লাভ করেন।

১৯ শতক ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

অনেকেই ১৭৮৬ সালকে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মবছর হিসাবে গণ্য করেন। ওই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। যেখানে তিনি বলেন, সংস্কৃত গ্রিক, লাতিন, কেল্টিয় ও জার্মান ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের গাঠনিক সাদৃশ্য রয়েছে এবং প্রস্তাব করেন, যে এগুলো সবই একই ভাষা থেকে উদ্ভুত। দোন্সের এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে সমগ্র ১৯ শতক জুড়ে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও ধ্বনিসম্ভারের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করেন। এবং ফলস্বরূপ আবিষ্কার হয়, যে আসলেই লাতিন, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষাগুলো পরস্পর সম্পর্কিত, ইউরোপের বেশিরভাগ ভাষার মধ্যে বংশগত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এগুলো সবই একটি আদি ভাষা 'প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা থেকে উদ্ভূত। ১৯ শতকের শেষের দিকে 'নব্য ব্যাকরণবিদেরা' দেখান যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আদি ভাষাগুলোর উচ্চারণের সুশৃঙ্খল, নিয়মাবদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাষাগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

২০ শতক, সোস্যুর, এককালিক ভাষাবিজ্ঞান ও সংগঠনবাদ

১৯ শতকের শেষে সুইস ভাষাবিজ্ঞাসী ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর ভাষা গবেষণার গতিধারায় পরিবর্তন আনেন।

তিনিই প্রথম এককালীন ও কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন। ফলে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারের পরিবর্তে যে কোনও একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের বিবরণের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সোস্যুর আরও প্রস্তাব করেন যে, ভাষা ও উক্তি দুটি ভিন্ন সত্তা। তাঁর মতে ভাষা হল অদৃশ্য অভ্যন্তরীণ কাঠামো, আর উক্তি হল তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। সোস্যুর মত দেন যে, ভাষা বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কিত, পরস্পরনির্ভর উপাদানে তৈরি একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো বা সংগঠন। তাঁর এই মতের উপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে। বিখ্যাত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপির ও লিওনার্দো ব্লুমফিল্ড ছিলেন ভাষাবৈজ্ঞানিক সংগঠনবাদের পুরোধা। তাঁরা ভাষার গবেষণায় উপাত্তভিত্তিক সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর জোর দেন এবং বলেন, ভাষাবিজ্ঞানের কাজ ভাষা কী ভাবে কাজ করে তা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করা। ভাষা কী রকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে গবেষণা করা ভাষাবিজ্ঞানের কাজ নয়।

চমস্কি ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

১৯৫০-এর দশকেই কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী সংগঠনবাদের দুর্বলতা আবিষ্কার করেন। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোম চমস্কি সংগঠনবাদের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ভাষা যে একটি মানসিক প্রক্রিয়া ও পৃথিবীর সব ভাষাই যে কিছু সার্বজনীন বিন্যাস অনুসরণ করে, সে ব্যাপারে জোর দেন। চমস্কির এই লেখার ফলে ভাষাবিজ্ঞানের গতি আরেকবার পরিবর্তিত হয়। চমস্কি বিশ্বাস করেন, কোনও ব্যক্তির অচেতন, অব্যক্ত ভাষাবোধ এবং তার ভাষা প্রয়োগ দুটি ভিন্ন বস্তু। তাঁর মতে, ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ হল মানুষের ভাষাবোধ যেসব অন্তর্নিহিত মানসিক সূত্র দিয়ে গঠিত সেগুলো আবিষ্কার করা। চমস্কি আরও বলেন, যে সব ভাষার মানুষই ভাষা বিষয়ক কিছু সর্বজনীন ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যাদের সমষ্টিগত নাম তিনি দেন 'বিশ্বজনীন ব্যাকরণ'।

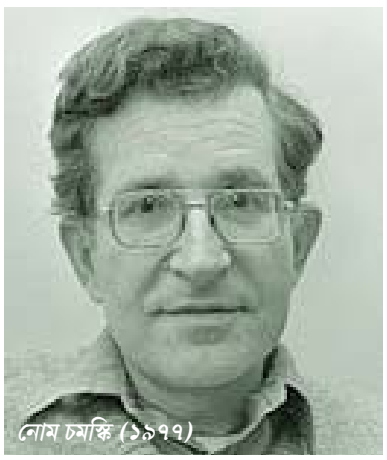

নোম চমস্কি (১৯৭৭)

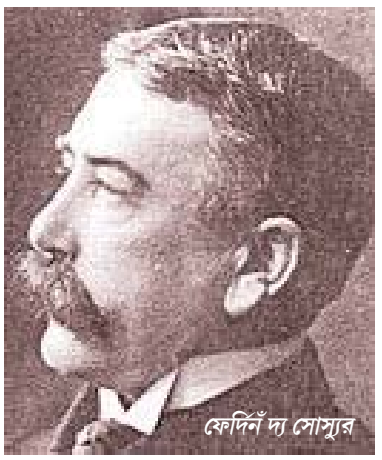

ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর

উল্লেখ্য, চমস্কির ধারায় 'ব্যাকরণ' বলতে ভাষা বিষয়ক প্রথাগত কিছু আনুশাসনিক নিয়মের সমষ্টিকে বোঝানো হয় না। বরং মানবমনের বিমূর্ত ভাষাবোধ, যা মানুষকে কথা বলতে, বুঝতে কিংবা ভাষা শিখতে সাহায্য করে, সেটিকে নির্দেশকারী ও ব্যাখ্যাকারী ভাষাবৈজ্ঞানিক সূত্রসমষ্টিকে বোঝায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চমস্কির প্রস্তাবিত রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণিক কাঠামোর গবেষণা করা হয়। চমস্কি বাক্যতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের মূল ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। '৫০ ও '৬০-এর দশকের প্রাথমিক প্রকাশের চমস্কির নিজস্ব তত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে বেশ কয়েকবার। এছাড়া, চমস্কীয় তত্ত্বের কিছু তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, যেগুলি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য সংক্রান্ত চমস্কীয় মতবাদ ও স্বতঃসিদ্ধগুলো অনেকাংশেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এদের মধ্যে 'কারক ব্যাকরণ', 'সাধারণীকৃত পদ সংগঠন ব্যাকরণ', 'সৃষ্টিশীল অর্থবিজ্ঞান', 'মস্তক চালিত পদ সংগঠন ব্যাকরণ', 'আভিধানিক কার্যমূলক ব্যাকরণ', 'সম্পর্কমূলক ব্যাকরণ' এবং 'অপটিমালিটি তত্ত্ব' অন্যতম। চমস্কীয় মূলধারার বাইরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে শ্রেণিকরণবাদী একটি ধারা আছে, যে ধারার অনুসারী ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষাকে তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করার চেষ্টা করেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে মানবমনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বোধ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসাবে ভাষাবিজ্ঞান নজির স্থাপন করে নিয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভাষার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করে ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি

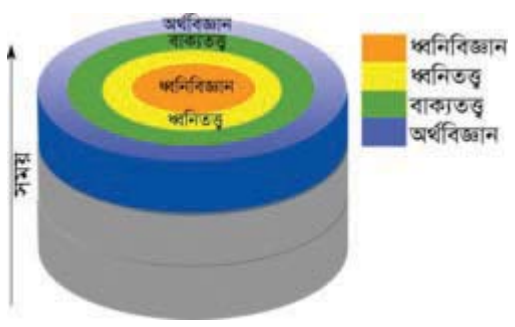

এককালিক তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলির সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে এগুলির প্রতিটিই পরিবর্তিত হয়

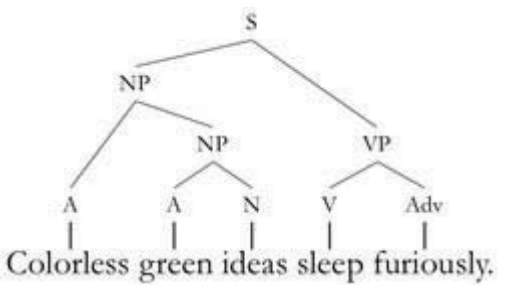

চমস্কীয় পদ্ধতিতে বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে একটি অর্থহীন বাক্যের গঠন বর্ণনা

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | ভূগোল

বায়ুর চাপ

আজ আলোচনা করব বায়ুর চাপ নিয়ে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকটা ফুলে ওঠে? কেন জানো? কারণ, শ্বাস নিয়ে তুমি বেশি বাতাস বুকে ঢোকাও। তাই ওই বাতাসের জন্য বেশি জায়গা লাগে। বোতল বা গ্লাস থেকে সরু নলে করে যখন সরবত খাও তখন প্রথমে ওই নলের ভেতরের বাতাস টেনে নাও বলেই ওই ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করতে নলের মধ্যে দিয়ে জলটা উঠে আসে। বাতাসের বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, কিন্তু আয়তন আছে, ওজন আছে। বাতাস যখন বয়ে যায়, তখন তাকে অনুভব করা যায়। গাছের পাতা নড়ে, নৌকার পাল ওড়ে, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়।

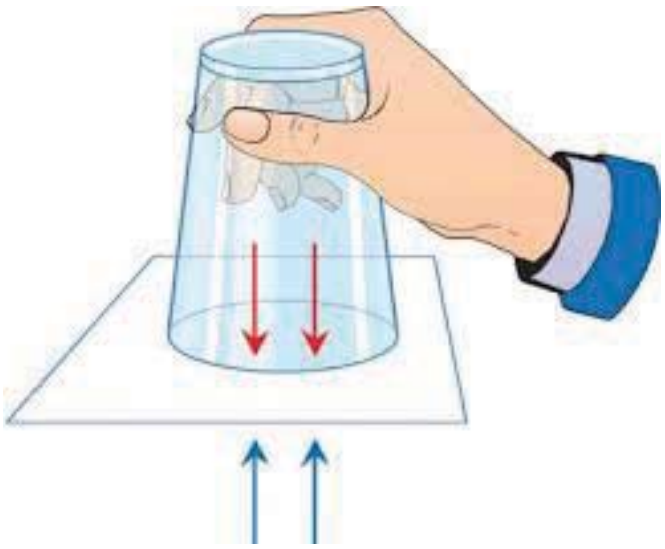

বায়ুর চাপ: একটা গ্লাসে জল ভর্তি করে গ্লাসটি পোস্টকার্ড দিয়ে চাপা দাও। তারপর উল্টে দাও। দেখবে, কিছু একটা ওই পোস্টকার্ডটিকে উপরের দিকে ঠেলে রাখছে। ওটাই বায়ুর চাপ, যা জলকে নীচে পড়তে দিচ্ছে না। তোমার চারপাশেও বাতাস রয়েছে। তারা তোমার উপর চাপ দিচ্ছে। প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এই চাপ প্রায় ১ কিলোগ্রাম। আর প্রতি বর্গফুটে প্রায় ১ টন। কিন্তু তুমি এই চাপ বুঝতে পারছ না। কারণ, তোমার শরীরের ভিতরেও বাতাস আছে। আর সেই বাতাসও বাইরের বাতাসের সমান ও বিপরীত চাপ দিচ্ছে। তাই তুমি বাইরের বাতাসের চাপ বুঝতে পারছ না।

বায়ু চাপ দেয় কেন?

কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় সব পদার্থই অসংখ্য অণু দিয়ে তৈরি। কঠিন বা তরল পদার্থকে আমরা দেখতে পেলেও গ্যাসীয় পদার্থকে আমরা দেখতে পাই না। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি আলগাভাবে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগায়, কোনও বস্তুর সঙ্গে বাতাসের এই অণুগুলির যখন ধাক্কা লাগে, তখন এই ধাক্কার কারণে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকেই বায়ুচাপ বলে। আয়তন যত কমে, অণুগুলির মাঝের দূরত্ব তত কমে। ফলে ঘনত্ব বাড়ে, অণুগুলির ধাক্কাও বাড়ে, যার ফলে চাপও বাড়ে। দৈনন্দিন জীবনে ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে বায়ুচাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোনও জায়গায় বায়ু বেশি ঘন হলে সেখানে বায়ুর চাপ বেশি হয়। আবার কোনও জায়গায় বায়ু হালকা হলে সেখানে বায়ুর চাপও কম হয়। আর বায়ুচাপের এই তারতম্যের জন্যই বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ুচাপের পার্থক্য বেশি হলে বায়ুপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বায়ুচাপের পার্থক্য কমে গেলে বায়ুপ্রবাহের বেগও কমে যায়। মনে রাখবে, বায়ু সব সময় বেশি চাপের জায়গা থেকে কম চাপের জায়গায় প্রবাহিত হয়। আবার এটাও জেনে রাখা দরকার যে, বায়ুর চাপ কমবেশি হওয়ার অন্য একটি কারণ হল তাপ। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার ওপর বায়ুচাপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনও জায়গায় তাপমাত্রা বেশি হলে সেই সমস্ত জায়গার বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে সেখানে বায়ুচাপ কমে যায়। একে নিম্নচাপ বলা হয়। তখন আশপাশ থেকে, যেখানে বায়ু বেশি সেখান থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এভাবেই বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ুচাপের তারতম্যের দ্বারা বায়ুপ্রবাহের বেগ ও দিক নির্ধারিত হয়। যেখানে তাপমাত্রা কম হয়, সেখানে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে। ফলে সেই সব জায়গায় বায়ুচাপও বেশি হয়ে থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবে, আমাদের দেশে শীতকালে বায়ু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। ঠিক একই কারণে এমন ঘটনা ঘটে।

তবে এই বায়ুর চাপ সব জায়গায় সমান নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে বা সমুদ্র সমতলে বায়ুচাপ সবচেয়ে বেশি হয়। কারণ সমুদ্র সমতলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও উপরের স্তরে বায়ুর প্রবল চাপে বায়ুর অণুগুলি পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসে বায়ুর ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে বায়ুর চাপও বেশি হয়। মনে রাখবে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনও স্থানের উচ্চতার সঙ্গে সেই স্থানের বায়ুচাপ ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বাড়লে বায়ুচাপ কমতে শুরু করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতি ১১০ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর চাপ ১ সেমি বা ১.৩৪ মিলিবার হারে কমে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুচাপ মাপা হয়। বায়ুচাপ পরিমাপের একক হল মিলিবার।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | বিজ্ঞান

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ বল

আজ আমরা আলোচনা করব স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল নিয়ে। আর এই আলোচনার শুরুতেই আসবে অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ বলের কথা। আমরা জানি, এই মহাবিশ্বের যে কোনও বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল, এই বলকে অভিকর্ষ বল বলে। মহাবিশ্বে শুধুমাত্র পৃথিবীই তার কাছাকাছি সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে তাই নয়, এই বিশ্বের যে কোনও দুটি বস্তুকণাই তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একে অন্যকে আকর্ষণ করে। এই বলের নাম মহাকর্ষ। আসলে অভিকর্ষও একটি মহাকর্ষ। পৃথিবী ও পৃথিবীর আশপাশে থাকা অন্য কোনও বস্তুর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে, সেই আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বল বলে।

সর্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক: মহাকর্ষ ধ্রুবক (প্রতীক: 'G', কারণ 'G'-এর মান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায় এক থাকে) একটি প্রায়োগিক ভৌত ধ্রুবক। এই ধ্রুবক জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। মহাকর্ষীয় বলের সূত্র অনুযায়ী, দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণীয় বল (F)- তাদের ভরের (m1 ও m2) সমানুপাতিক ও তাদের মধ্যকার দূরত্ব (r) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

এবার আমরা আলোচনা করব অভিকর্ষজ ত্বরণ নিয়ে। এর আগে আমরা জেনেছি, পৃথিবী ও অন্য যে কোনও বস্তুর মধ্যে বা দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে অভিকর্ষ বল বলা হয়। আবার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে, বল প্রয়োগে বস্তুর ত্বরণ হয়। সুতরাং এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও ত্বরণ হবে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনও বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়। অভিকর্ষজ ত্বরণকে 'g' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে হালকা বস্তুর তুলনায় ভারী বস্তু আগে মাটি স্পর্শ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করে দেখান যে, হালকা-ভারী সব বস্তুকেই একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে ছাড়লে তারা একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করবে। একটা পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা এই ব্যাপারটা আরও ভালো বুঝতে পারবে। একটি কয়েন ও একটি সমান মাপের কাগজের টুকরো কিছুটা উপর থেকে ছেড়ে দাও। দেখবে কয়েনটি আগে মাটি স্পর্শ করছে। এবার কাগজের টুকরোটাকে কয়েনের উপর বসিয়ে দাও। দেখবে দু'টিই একই সময়ে মাটি স্পর্শ করছে। আগের বার কয়েন যেভাবে বায়ুর বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছে, কাগজের টুকরোটি সেভাবে পারেনি। কিন্তু পরের বার কয়েন ও কাগজের টুকরো একসঙ্গে বায়ুর বাধা অতিক্রম করায় কয়েন ও কাগজ একসঙ্গে পড়েছে।

এবার ভেবে বলো বায়ুর বাধা না থাকলে কয়েন ও কাগজকে যদি আলাদাভাবে ফেলা হতো তারা কি একইসময় পড়ত, নাকি কয়েন আগে পড়ত?

পৃথিবীর টানে কোনও বস্তু পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকলে তাকে পতনশীল বস্তু বলে।

স্থির অবস্থা থেকে বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিও-র সূত্রগুলোর মর্মার্থ হল—

১) একই উচ্চতা ও স্থির অবস্থা থেকে অবাধে সব পতনশীল বস্তুই একই ভাবে সমান দ্রুততায় নীচে নামে।

২) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর বেগও বাড়তে থাকে।

৩) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব বাড়ে।

পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে একটা পাথরের টুকরোকে সোজা উপরে ছুঁড়ে দাও। দেখবে পাথরটি যত ওপরে ওঠে সেটির গতি কমতে থাকে। কেন? কমতে কমতে সেই গতির দিক উলটে গিয়ে পাথরটি আবার তোমার হাতে ফিরে আসে, কেন?

নিশ্চয় আন্দাজ করেছ যে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানই এর কারণ।

অভিকর্ষের টানের দিকে ত্বরণ হয়। ফলে ঊর্ধ্বমুখী বেগ কমে ও এক সময় অভিকর্ষের টানের দিকে তা বাড়তে থাকে। তাই পাথরটি ফিরে আসে।

এবার ভূমির সঙ্গে কোনাকুনিভাবে একটি পাথরের টুকরোকে ছোঁড়ো। পাথরটির গতিপথ লক্ষ করো।

এই গতিপথ এমন হল কেন?

এক্ষেত্রে অভিকর্ষের টান ভূমির দিকে। পাথরের দিক ও ত্বরণের দিক ছবিতে লক্ষ করো।

নিশ্চয় বুঝতে পারছ, বেগের দিক বদলাতে বদলাতে আবার ভূমির দিকেই ঘুরে যাওয়ার জন্য যা দায়ী তা হল অভিকর্ষের টান। অভিকর্ষের টানে এ ধরনের চলন্ত বস্তুর বেগ পালটায় ও বস্তুটি ছবির মতো বাঁকা পথে ভূমিতে ফিরে আসে। পৃথিবী থেকে আকাশে পাঠানো উপগ্রহকে এভাবেই ছোঁড়ার ফলে তা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

কীভাবে শুরু হল দোল উৎসব?

আগের পাতার পর

এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু দোল বা হোলি আসলে কী? কীভাবে শুরু হল রঙের এই খেলা?

'হোলি' বা 'দোল' উৎসবের নেপথ্যে বিভিন্ন পৌরাণিক ও লোককাহিনি প্রচলিত আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র

উৎসব 'হোলি' যা সাধারণত 'হোলিকা দহন' নামে সুপরিচিত। অঞ্চলভেদে হোলি উদ্‌যাপনের ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু উদ্‌যাপনের রীতি এক। রং উৎসবের আগের দিন 'হোলিকা দহন' হয় অত্যন্ত ধুমধাম করে। শুকনো গাছের ডাল, পাতা, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দাহ্যবস্তু দিয়ে উঁচু থাম তৈরি করে তাতে আগুন লাগিয়ে অসুরত্ব এবং অমঙ্গল বিনাশ করা হয় 'হোলিকা দহন'-এর মাধ্যমে।

কথিত আছে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পরম শত্রু দেবলোক। ব্রহ্মার বর লাভ করে হিরণ্যকশিপু দেবতাদের অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। এমনকী, দেবলোকও আক্রমণ করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ অসুর বংশে জন্ম নিয়েও ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত।

এরপর পরের পাতায়

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

কীভাবে শুরু হল দোল উৎসব?

আগের পাতার পর

বিষ্ণুকে নিজ পিতার উপরে স্থান দেওয়ায় নিজের ছেলেকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন হিরণ্যকশিপু। কিন্তু বিষ্ণুর আশীর্বাদে সব চেষ্টা বিফলে যায়। হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকাও ছিলে বরপ্রাপ্ত। আগুনে পুড়ে তার মৃত্যু হবে না। তাই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হত্যার জন্য হোলিকার সাহায্য নেন। বাবার আজ্ঞায় হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করেন। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখার মধ্যে প্রহ্লাদ ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড থেকে বেঁচে যান। কিন্তু অন্যায় কাজে শক্তি প্রয়োগ করায় আগুনে ভস্ম হয়ে যান হোলিকা। হোলিকার এই অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কাহিনিই দোলের আগের দিন অনুষ্ঠিত 'হোলিকা দহন'-এর সঙ্গে জড়িত।

অন্যদিকে, বসন্তের পূর্ণিমার এই দিনে কেশি নামের অসুরকে বধ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কোথাও কোথাও অরিষ্টাসুর নামক অত্যাচারী অসুর বধের কথাও প্রচলিত আছে। অন্যায় শক্তিকে ধ্বংস করার পর আনন্দোৎসবে মেতে ওঠেন সকলে।

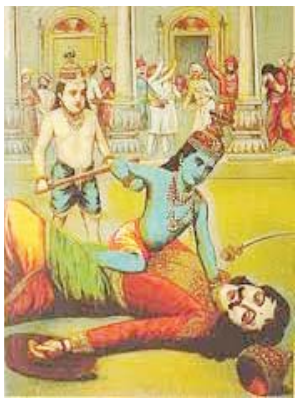

এরপর পরের পাতায়

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | বিজ্ঞান

অ্যানিম্যালিয়া

আজ আমাদের আলোচনার বিষয় অ্যানিম্যালিয়া। তোমরা জানো কি, প্রাণিরাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র দেখা যায়। প্রাণিরাজ্যে সকল জীব ইউক্যারিওটিক কোষযুক্ত, বহুকোষী এবং হেটেরোট্রফিক। এদের কোষে কোনও কোষপ্রাচীর থাকে না এবং অধিকাংশ প্রাণী গমনে সক্ষম।

কলাতন্ত্রের উপস্থিতি, সিলোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে বিভিন্নভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

বিবর্তনের ধারায় সরল প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নীচে প্রাণিরাজ্যের পর্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

পরিফেরা: শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য–

i) বহুকোষী দেহে সুনির্দিষ্ট কলা, কলাতন্ত্র, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র অনুপস্থিত।

ii) দেহে নালিকাতন্ত্র রয়েছে, যা এ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

iii) দেহের অভ্যন্তরে স্পঞ্জোসিল নামে প্রশস্ত গহ্বর রয়েছে, যা অসক্যুলাম নামে বড় আকারের ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরের দিকে উন্মুক্ত।

iv) দেহপ্রাচীরে অস্টিয়া নামক অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির ছিদ্র বিশিষ্ট।

v) দেহে ফ্লাজেলা বিশিষ্ট কোষ কোয়ানোসাইট দিয়ে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

vi) এদের দেহ ফুলদানি, সিলিন্ডার, নলাকার, কুশন আকৃতির।

vii) দেহপ্রাচীর দ্বি-স্তর বিশিষ্ট। বাইরের স্তর পিনাকোডার্ম এবং ভেতরের স্তর কোয়ানোডার্ম। উভয় স্তরের মাঝে সাধারণত কোষবিহীন মেসেনকাইম রয়েছে, যাতে স্পিকিউল, স্পঞ্জিন ও অ্যামিবয়েড কোষ দেখতে পাওয়া যায়।

viii) এরা সকলেই জলজ প্রাণী। কিছু প্রজাতি মিষ্টি জলে থাকে।

ix) এদের অযৌন প্রজনন বাডিং, ফিউশন ও গ্যামুউল ধরনের। অন্যদিকে, যৌন প্রজনন গ্যামেটোগনি ধরনের।

উদাহরণ– সাইকন, নেপচুনস্ কাপ, স্পঞ্জ।

নিডারিয়া: শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য– কিছু কোষ স্নায়ুকলা গঠন করলেও অধিকাংশ কোষই বিচ্ছিন্ন। তবে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষিত। এরা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী, এদের ভ্রূণ দ্বি-স্তর বিশিষ্ট। বাইরের স্তরকে বলে এক্টোডার্ম ও ভিতরের স্তরকে বলে এন্ডোডার্ম। এদের দেহের ভেতরে প্রশস্ত গহ্বর যা সিলেন্টেরন নামে পরিচিত। এদের দেহত্বকের বাইরের দিকে প্রচুর পরিমাণে নিডোব্লাস্ট নামক কোষ আছে, যারা বিষাক্ত পদার্থ রাখার জন্য নিমাটোসিস্ট নামক একটি থলি ও বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগ করার জন্য থ্রেড টিউব নামে চাবুকের মতো নল বহন করে।

উদাহরণ– জেলিফিশ, হাইড্রা।

টিনোফোরা: শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য–

১) টিনোফোরা পর্বভুক্ত সকল প্রাণীই সামুদ্রিক, দেহ দ্বিঅপরীয়ভাবে প্রতিসম। এরা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট, এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম সমন্বিত। এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্মের মাঝে অ্যামিবোসাইট কোষ এবং পেশিকোষ সমৃদ্ধ মেসোর্ডাম থাকে।

২) এদের দেহে সমদূরত্বে অবস্থিত ৮টি সিলিয়াযুক্ত চিরুনির মতো কোম্বপ্লেট থাকে। এগুলি গমনে সাহায্য করে।

৩) কর্ষিকাতে বিশেষ ধরনের আঠালো কোষ থাকে একে ল্যাসো কোষ বলে। এদের অ্যাবোরাল প্রান্তে স্ট্যাটোসিস্ট নামক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে। উদাহরণ– বেরো, হর্মিফোরা।

প্ল্যাটিহেলমিনথিস:

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য– ১) প্ল্যাটিহেলমিনথিস পর্বভুক্ত সকল প্রাণীর দেহ ওপর-নীচে চ্যাপটা, এদের দেহে সর্বপ্রথম যন্ত্র ও তন্ত্র দেখা যায়। ২) দেহে ত্রি-স্তরবিশিষ্ট এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম থাকে। ৩) এদের রেচন অঙ্গ ফ্লেমকোষ। উদাহরণ– ফিতাকৃমি, যকৃত কৃমি।

নিমাটহেলমিনথিস: শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য–

১) দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, নলাকার, খণ্ডবিহীন এবং দু-প্রান্ত ক্রমশ সরু। দেহের অগ্রভাবে মুখছিদ্র এবং পশ্চাদভাগে পায়ুছিদ্র বর্তমান। ২) নিমাটহেলমিনথিস পর্বের প্রাণীরা ত্রিস্তরবিশিষ্ট। এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম থাকে। অর্থাৎ দেহগহ্বর মেসোডার্ম বেষ্টিত নয়। ৩) দেহ শক্ত কিউটিকল দ্বারা আবৃত এবং এদের দেহে ছদ্মসিলোম থাকে। উদাহরণ– গোলকৃমি, গোদকৃমি।

অ্যানিলিডা: শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য–

১) অ্যানিলিডা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ লম্বা ও নলাকার, দেহ অনেকগুলি আংটির মতো খণ্ডক বা মেটামেয়ার দ্বারা গঠিত।

২) দেহ ত্রিস্তরবিশিষ্ট, এদের দেহে মেসোডার্ম স্তরবেষ্টিত প্রকৃত সিলোম থাকে।

৩) এদের দেহে বদ্ধ রক্তসংবহনতন্ত্র দেখা যায়। হিমোগ্লোবিন-এর পরিবর্তে রক্তরসে থাকে। প্রতিটি দেহখণ্ডকে একজোড়া করে নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে। উদাহরণ– কেঁচো, জোঁক, নেরিস।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইতিহাস

আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস শব্দের অর্থ 'অতীতের কথা'। তবে অতীতের সব কথা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায় না। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় কোনও 'ঐতিহাসিক ঘটনা' থেকে তথ্য নির্বাচন, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্যের গ্রহণ-বর্জন এবং তার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হল ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। আর সমগ্র ধারাটিকে বলে 'ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি'।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। তবে অতীতের সব উপাদান ইতিহাসের উপাদান হতে পারে না। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় সরকারি নথিপত্র, আত্মকথা, চিঠিপত্র, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণে বিশেষ সাবধান না হলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটতে পারে। আর বিকৃত ইতিহাস যে কোনও জাতির পক্ষে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। ফলে নিরপেক্ষভাবে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের অবদান বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান:

ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। এই সমস্ত উপাদান হল:

১) **সরকারি নথি:**

ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সরকারি নথি। এই সমস্ত সরকারি নথি থেকে ভারতের ইতিহাসের অনেক কথা জানা সম্ভব। আমলাদের রিপোর্ট, পুলিশ প্রতিনিয়ত যে সমস্ত রেকর্ড তৈরি করে তার থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট থেকেও অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। তবে এই সমস্ত নথির মধ্যে কোন তথ্য বস্তুনিষ্ঠ এবং কোন তথ্য নয়, তা খুঁজে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব একজন ইতিহাসবিদের কাঁধে।

২) **আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা:**

কেউ অকপটে নিজের জীবনকথা যখন নিজে লেখেন তখন তাকে বলে আত্মজীবনী। আর জীবনের নানা ঘটনা যা স্মৃতিপটে সঞ্চিত থাকে, পরে কেউ যদি সেই স্মৃতি সংকলিত করেন তখন তাকে বলে স্মৃতিকথা। ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে এই সমস্ত আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিত', শিবপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আ নেশন ইন মেকিং', পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া', মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম'-এর কথা বলা যেতে পারে। এই সমস্ত রচনা থেকে ফুটে উঠেছে সমকালীন ভারতের বাস্তব ছবি। তবে এইসব উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের মানসিক অবস্থা, মনোভাব, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লেখার ভুলভ্রান্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা এই সমস্ত কিছু যাচাই করে ইতিহাসচর্চায় ব্যবহার করা হয়।

৩) **সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র:**

সাময়িকপত্র নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। জার্নাল বা বিশেষ বিনোদনমূলক রচনার ক্ষেত্রে এটি ম্যাগাজিন নামে অভিহিত। এটি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক রূপে প্রকাশ পায়। এছাড়া দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক সাময়িকপত্র হল জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগদর্শন' (১৮১৮ সালের এপ্রিল) এবং প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ।' এছাড়া ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ভারতের ইতিহাসচর্চায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ।' এর সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র। এছাড়া ১৮৭৮ সালে মাসিক পত্রিকা 'কল্পদ্রুম' প্রকাশ করেছিলেন দ্বারকানাথ।

৪) **ফোটোগ্রাফ:**

আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় ফোটোগ্রাফের ব্যবহার কবে থেকে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক ১৮৪০ সালে ভারতে ফোটোগ্রাফের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় লিথোগ্রাফের ব্যবহার শুরু হয়, যার ভিত্তি হল ফোটোগ্রাফ।

৫) **সাহিত্য:**

ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাহিত্য। সাহিত্যই হল সমাজের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে সাহিত্যকে গুরুত্ব দিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিভিন্ন শিল্পকর্মে সমাজের এই ছবি বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

৬) **ইন্টারনেট:**

বর্তমান যুগে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বহু তথ্য জানতে পারি। কোনও বই ছাড়া, লাইব্রেরি ছাড়া, শিক্ষক-গবেষক ছাড়া শুধুমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা যা চাই তাই পাই। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাগুলি হল: ক) কোনও বই কাছে রাখার প্রয়োজন হয় না, খ) সুবিধা ও প্রয়োজনমতো তথ্য সংগ্রহ করা যায়, গ) বহু জটিল ও দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

তবে ইন্টারনেটে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা আছে। এর প্রধান সমস্যা হল প্রাসঙ্গিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা। কারণ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা হাজারও তথ্যের মধ্যে থেকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বেছে নেওয়া একজন ইতিহাসবিদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

স্পেশাল টিউশন | বাংলা ব্যাকরণ

শব্দ

আগের সংখ্যাগুলিতে আমরা ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা শব্দ সম্পর্কে জানব।

শব্দ হচ্ছে ভাবের দ্যোতক। এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যদি কোনও অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। অর্থযুক্ত ধ্বনিকে বলে শব্দ। কোনও বিশেষ সমাজের নর-নারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি হচ্ছে সেই সমাজের নর-নারীর ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষার শব্দকে উপত্তিগত দিক দিয়ে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি– তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ।

১. তৎসম শব্দ: সংস্কৃত ভাষার যে-সব শব্দ পরিবর্তিত না হয়ে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে সব শব্দকেই বলা হয় তৎসম শব্দ। উদাহরণ– চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ: যে-সব সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম। যেমন– জ্যোৎস্না<জ্যোছনা, শ্রাদ্ধ<ছেরাদ্দ, গৃহিণী<গিন্নী, বৈষ্ণব<বোষ্টম, কুৎসিত<কুচ্ছিত।

৩. তদ্ভব শব্দ: বাংলা ভাষা গঠনের সময় প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকে যে সব শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। অবশ্য তদ্ভব শব্দের মূল অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় থাকতে হবে। যেমন– সংস্কৃত 'হস্ত' শব্দটি প্রাকৃততে 'হত্থ' হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আর বাংলায় এসে সেটা আরও সহজ হতে গিয়ে হয়ে গেছে হাত'। তেমনি, চর্মকার< চম্মআর< চামার।

৪. দেশি শব্দ: বাংলা ভাষাভাষীদের ভূখণ্ডে আদিকাল থেকে যারা বাস করত, সেইসব আদিবাসীদের ভাষার যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে সব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। এই আদিবাসীদের মধ্যে আছে- কোল, মুণ্ডা, ভীল ইত্যাদি। মেমন, কুড়ি (বিশ)- কোলভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)- মুণ্ডারী ভাষা।

৫. বিদেশি শব্দ: বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অন্য ভাষাভাষীর মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা থেকে যে সব শব্দ গ্রহণ করেছে, বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে অন্য ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। যে কোনও ভাষার সমৃদ্ধির জন্য বিদেশি শব্দের আত্তীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এদিক দিয়ে বাংলা ভাষা বেশ উদারও বটে।

আরবি শব্দ: আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওযু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, হওবা, হসবি, যাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল, আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায়।

ফারসি শব্দ: খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ, আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাস, রফতানি, হাঙ্গামা।

ইংরেজি শব্দ: প্রায় অপরিবর্তিত উচ্চারণে- চেয়ার, টেবিল। পরিবর্তিত উচ্চারণে- আফিম (opium), ইস্কুল (school), বাক্স (box), হাসপাতাল (hospitai), বোতল (bottle)।

পর্তুগিজ শব্দ: আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি।

ফরাসি শব্দ: কার্তুজ, কুপন , ডিপো, রেস্তোরাঁ।

ওলন্দাজ শব্দ: ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন।

গুজরাটি শব্দ: খদ্দর, হরতাল।

পাঞ্জাবি শব্দ: চাহিদা, শিখ।

তুর্কি শব্দ: চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা।

চিনা শব্দ: চা, চিনি, লুচি।

মায়ানমার/বর্মি শব্দ: ফুঙ্গি, লুঙ্গি

জাপানি শব্দ: রিকশা, হারিকিরি

মিশ্র শব্দ: এছাড়াও আরেকটি বিশেষ ধরনের শব্দ আছে। দুইটি ভিন্ন ধরনের শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে একত্রিত হলে ওই নতুন শব্দটিকে বলা হয় মিশ্র শব্দ। এক্ষেত্রে যে দুইটি শব্দ মিলিত হল, তাদের শ্রেণিবিভাগ চিনতে পারাটা খুব জরুরি। যেমন– রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), হেড-মৌলভী (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পন্ডিত (ইংরেজি+তসম), খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি+তসম), ডাক্তারখানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা)

অর্থগত ভাবে শব্দসমূহকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. যৌগিক শব্দ: যে-সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই, তাদের যৌগিক শব্দ বলে। অর্থাৎ, শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় যাদের অর্থ পরিবর্তিত হয় না, তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন– ১) গায়ক গৈ+অক যে গান করে। ২) কর্তব্য কৃ+তব্য যা করা উচিত। ৩) বাবুয়ানা বাবু+আনা বাবুর ভাব। ৪) মধুর মধু+র মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত। ৫) দৌহিত্র দুহিতা+ষ্ণ্য (দুহিতা= মেয়ে, ষ্ণ্য= পুত্র) কন্যার মতো, নাতি

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ: প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ আলাদা হয়, তাদেরকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন– ১) হস্তী হস্ত+ইন হাত আছে যার একটি বিশেষ প্রাণী, হাতি। ২) গবেষণা গো+এষণা খোঁজা ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা। ৩) বাঁশি বাঁশ+ইন বাঁশ দিয়ে তৈরি বাঁশের তৈরি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। ৪) তৈল তিল+ষ্ণ্য তিল থেকে তৈরি স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ থেকে তৈরি যে কোনও স্নেহ পদার্থ। ৫) প্রবীণ প্র+বীণা প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজায় যিনি অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি। ৬) সন্দেশ সম+দেশ সংবাদ মিষ্টান্ন বিশেষ।

৩. যোগরূঢ় শব্দ: সমাস নিষ্পন্ন যে সব শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থ আলাদা হয়, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন– ১) পঙ্কজ পঙ্কে জন্মে যা পদ্মফুল। ২) রাজপুত রাজার পুত্র একটি জাতি বিশেষ, ভারতের একটি জাতি। ৩) মহাযাত্রা মহাসমারোহে যাত্রা মৃত্যু। ৪) জলধি জল ধারণ করে যা/এমন সাগর

৪. নবসৃষ্ট বা পরিশব্দ বা পারিভাষিক শব্দ: বিভিন্ন বিদেশি শব্দের অনুকরণে ভাবানুবাদমূলক যেসব প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোকে নবসৃষ্ট বা পরিশব্দ বা পারিভাষিক শব্দ বলে। মূলত প্রচলিত বিদেশি শব্দেরই এরকম পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা হয়েছে। যেমন– অম্লজান-Oxygen, সচিব-Secretary, স্নাতক-Graduate, নথি-File, স্নাতকোত্তর -Post Graduate, প্রশিক্ষণ-Training, সমাপ্তি-Final, ব্যবস্থাপক-Manager, সাময়িকী-Periodical, বেতার-Radio

স্পেশাল টিউশন | ইংলিশ গ্রামার

Parts of Speech

আমরা Sentece এবং তার শ্রেণিবিভাগ পড়েছি। এবার আমরা Parts of Speech পড়ব।

Words are divided into different kinds or classes, called Parts of Speech, according to their use; that is, according to the work they do in the sentence. বাক্যে ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির শব্দগুলিকে Parts of Speech বলে।

প্রকারভেদ: ইংরেজিতে Parts of Speech আট প্রকার। যথা: Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection

Noun (বিশেষ্য): A Noun is a word used as the name of a person, place or thing.

A Noun is a naming word সহজভাবে বলা যায়, যার দ্বারা কোনও ব্যক্তি, স্থান বা বস্তর নাম বোঝায়, তাকে Noun বলে। যেমন–Suman is a brilliant student. (ব্যক্তির নাম), Delhi is the capital of India. (স্থানের নাম), Gold is a valuable metal. (বস্তর নাম)।

Pronoun (সর্বনাম): A Pronoun is a word used instead of a noun.

A word used instead of a noun is called a Pronoun.

সহজভাবে বলা যায়, যে Word কোনও Noun-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে Pronoun বলে। যেমন: Ashok is a good boy. (Noun), He goes to school everyday. (Pronoun), He is an intelligent boy. (Pronoun)।

Adjective (বিশেষণ): An Adjective is a word used to add something to the meaning of a Noun.

An Adjective is a word used for qualifying (or adding something to) the meaning of a Noun or Pronoun.

সহজভাবে বলা যায়, যে Word কোনও Noun বা Pronoun-এর দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে Adjective বলে। যেমন–Jahid is a bad boy. (দোষ), Runa is a good girl. (গুণ), He is ill. (অবস্থা), I have five pens. (সংখ্যা), He has much money. (পরিমাণ)।

Verb (ক্রিয়া): A Verb is a word used to say something about some person, place or thing.

A Verb is a word used for saying something about a person or a thing.

সহজভাবে বলা যায়, যে word দ্বারা কোনও কাজ করা বোঝায়, তাকে verb বলে। যেমন– We play cricket. (Verb), He writes a letter. (Verb), She gives me pen. (Verb), He ran a race. (Verb)

Adverb (ক্রিয়া বিশেষণ): An Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb.

An Adverb qualifies anything except a Noun or a Pronoun

She is a very beautiful girl. (Adjective-কে বিশেষিত করে অর্থা modify করে), She walks very slowly. (Adverb-কে বিশেষিত করে অর্থাৎ modify করে)

Preposition (পদান্বয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধসূচক অব্যয়): A Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else.

A Pronoun is a word that is placed before a noun or a pronoun to show the relation of that noun or pronoun with any other word of the sentence.

The book is on the table. (Preposition)
The man is under the tree. (Preposition)
The fish is in the pond. (Preposition)
The bird flew over my head. (Preposition)

Conjunction (সংযোজক অব্যয়): A Conjunction is a word used to join words or sentences.

A Conjunction is a word for joining one word to another word, or one sentence to another sentence.

সহজভাবে বলা যায়, যে Word দুই বা ততোধিক শব্দ (word) বা বাক্যাংশ (clause)-কে যুক্ত করে, তাকে Conjunction বলে। যেমন– Ram and Shyam are good boys. (দুটি word-কে যুক্ত করেছে), Rupam is a boy but Runa is a girl. (দুটি Sentence- কে যুক্ত করেছে), Do the work or leave this place. (দুটি Sentence -কে যুক্ত করেছে)

8. Interjection (আবেগসূচক অব্যয়): An Interjection is a word which expresses some sudden feeling.

An Interjection is a word or sound thrown into a sentence to express some feeling of the mind.

যে word মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করে, তাকে Interjection বলে। যেমন–

Hurrah ! Today is holiday. (কী মজা- Interjection)
Alas ! He is dead. (হায়- Interjection)
Oh ! What a nice view. (আহা- Interjection)
Bravo ! You have done well. (সাবাশ– Interjection)

কীভাবে শুরু হল দোল উৎসব?

আগের পাতার পর

দোল উৎসবের ইতিহাসে আরও একটি কাহিনি বেশ প্রচলিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে রাধা এবং তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। সে সময় হঠাৎ শ্রীরাধা এক বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে লজ্জিত হন। রাধার লজ্জা ঢাকতে শ্রীকৃষ্ণ তখন বুদ্ধি করে শ্রীরাধা এবং সখীদের সঙ্গে আবির খেলা শুরু করেন। সকলকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেন শ্রীকৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণ এবং সখীদের এই আবির খেলার স্মরণেই হিন্দু সমাজ হোলি উৎসব পালন করে থাকে বলে প্রচলিত। আবার অনেকের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন থেকে দোলের উদ্ভব হয়েছে।

দোল উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে ভিন্নজনের ভিন্ন মত। হোলি উদযাপনের রীতিনীতিও পাল্টেছে সময়ের সাথে সাথে। বিষাক্ত রঙের ব্যবহার না করে অন্যায়কে পরাজিত করার আনন্দে সকলের মন রঙিন হয়ে উঠুক।

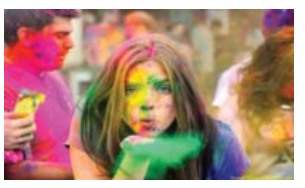

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

উত্তরণ এডু টিপস

ভালো ছাত্র হতে চাইলে...

প্রতিটি মানুষেরই মেধা রয়েছে। তবে কেউ তা ব্যবহার করে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কেউ তা ব্যবহার না করে বিফলতার দিকে ধাবিত হয়। ক্লাসের সবাই ভালো ছাত্র না-ও হতে পারে। আর ভালো ছাত্র হয়ে ওঠা জীবনের জন্য কতটা জরুরি, এটাও অনেকে বোঝে না। ভালো ছাত্র হওয়া তখনই সম্ভব যখন জীবনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। নিজের লক্ষ্যে অটল থেকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাওয়াই একজন ভালো ছাত্রের কর্তব্য। তবে অনেকেই নিজের এই অমূল্য সময়টা নষ্ট করে ফেলে পথভ্রষ্ট হয়ে। আজ জেনে নাও, কীভাবে একজন ভালো ছাত্র হতে পারবে জীবনে সাফল্য পাওয়ার জন্য।

লক্ষ্য স্থির করো: ভালো স্টুডেন্টদের মূল্যায়ন সব জায়গাতেই হয় এবং তারা অনেক সুযোগ পেয়ে থাকে জীবনের সফলতা অর্জনে। তুমিও যদি একজন ভালো স্টুডেন্ট হতে চান, তাহলে অবশ্যই জীবনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য তৈরি করে নাও। কোন পথে ঠিক কীভাবে এগোবে, সেই বিষয়ে গভীরভাবে ভাবো। এবং সেভাবেই একটা গতিপথ তৈরি করো। ভবিষ্যৎ নিয়ে সিরিয়াস হও। মনে রাখবে, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ছাত্রজীবন থেকেই এর রূপরেখা তৈরি করতে হবে। নিজেকে সেভাবেই তৈরি করো।

অধ্যবসায় আনো: ভালো স্টুডেন্ট হতে হলে তোমাকে অধ্যবসায় করতে হবে। জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী এগোতে গেলে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে। এর কোনও বিকল্প নেই।

ছাত্রজীবনের অধ্যবসায় পরবর্তী জীবনে সাফল্য এনে দেবে। কঠিন অধ্যবসায়ই আপনাকে একজন ভালো স্টুডেন্ট তৈরি হতে সাহায্য করবে। আজ তুমি যে অধ্যবসায় করবে, আগামী জীবনে এটিই তোমার চালিকাশক্তি হবে। জীবনে সফল হওয়ার কোনও শর্টকাট নেই। এরজন্য কঠিন পরিশ্রম করতেই হবে।

রুটিন তৈরি করো: তুমি ছাত্রজীবনে যে ধরনের কাজ করছ তার একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করো। রুটিনে পড়াশোনা এবং অন্যান্য কাজের সময়গুলো হিসাব করে ভাগ করে নাও। রুটিনে পড়ার সময়টুকু অবশ্যই বেশি রাখবে এবং সেই অনুযায়ী পড়াশোনা করে যাও। এতে দেখবে, ফলাফল ইতিবাচক আসবে। তবে কোনও নির্দিষ্ট কারণে রুটিন অনুসরণ করতে না পারলে, পরের দিন আলসেমি করবে না। রুটিনমাফিক চলার জন্য তোমাকে মনস্থির করতে হবে। ধৈর্য রেখে চলতে হবে। ভালো স্টুডেন্ট হতে গেলে ধৈর্য থাকা খুব জরুরি।

লাইব্রেরি ওয়ার্ক করো: ভালো স্টুডেন্টরা লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে পছন্দ করে বেশি। লাইব্রেরি ওয়ার্ক করলে খুব সহজেই কঠিন বস্তুকে আয়ত্ত করা যায়। এই কারণে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বাছাই করে তুমি ওই সময়টাতে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করো। দেখবে ভালো স্টুডেন্ট হয়ে ওঠা খুব সহজ হবে।

খারাপ বন্ধু ত্যাগ করো: জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট হতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেটি হল খারাপ বন্ধুদের ত্যাগ করতে হবে। খারাপ বন্ধু থাকলে তোমার সময়গুলো খুবই বাজে ভাবে নষ্ট হতে সময় লাগবে না। পড়াশোনা করতে পারবেই না, এই কারণেই ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোযোগ আনতে তুমি তোমার ফ্রেন্ড সার্কল থেকে খারাপ বন্ধুদের বাদ দাও। প্রয়োজনে ভালো বন্ধু যোগ করো। আর কে ভালো, কে খারাপ এটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তবে খারাপ বলে কথা বলাই ছেড়ে দেবে এমনটা নয়, এড়িয়ে যেতে পারো। খারাপ বন্ধুদের সাথে বেশি মেলামেশা তোমাকে বিভ্রান্ত করবে। তাই ভালো বন্ধু গড়ে তোলো। সম্ভব হলে খারাপ বন্ধুদেরও ভালো হয়ে উঠতে সাহায্য করো।

ক্যুইজ [৬]

১) টিউমার কয় প্রকার?
২) বিশ্বের একমাত্র কোন কৃষিবিজ্ঞানী শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান?
৩) সজনে ডাঁটা আসলে কী?
৪) মানবদেহে রক্তচাপের পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
৫) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য হরমোনের নাম কী?
৬) কোন মৌলের অভাবে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে?
৭) উদ্ভিদের পুষ্টিকে কী বলে?
৮) ভিটামিন কথার প্রবক্তা কে?
৯) গাড়ির হেডলাইটে প্রতিফলক রূপে কোন দর্পন ব্যবহৃত হয়?
১০) বংশগতির জনক কাকে বলা হয়?
১১) মানব মস্তিষ্কে কত নিউরোন আছে?
১২) প্ল্যাঙ্কটন কী?
১৩) কুইনাইন কোন উদ্ভিদের রেচন অঙ্গ?
১৪) অক্সালিক অ্যাসিড কোন উদ্ভিদে পাওয়া যায়?
১৫) কোন প্রাণীর জননতন্ত্রে ফ্যাট বডিস পাওয়া যায়?
১৬) এফিড্রা গাছে কোন উপক্ষার পাওয়া যায়?
১৭) কোনও বস্তুর বেগ ম্যাক সংখ্যার বেশি হলে বস্তুর বেগকে কী বলা হয়?
১৮) বরফ ও খাদ্য লবণের মিশ্রণের উষ্ণতা কত?
১৯) জিভের অগ্রভাগে কোন স্বাদকোরক থাকে?
২০) জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপ কত?
২১) মিশ্র গ্রন্থি কী কী?
২২) মায়াটোম পেশি কোন প্রাণীর দেহে থাকে?
২৩) তড়িপ্রবাহের একক কী?
২৪) ইউজেনিক্স-এর জনক কাকে বলে?
২৫) প্রথম আবিষ্কৃত বীজানু কী?

গত সংখ্যার উত্তর:
১) চেন্নাই
২) ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির
৩) ময়ূরাক্ষী
৪) সিঙ্গালিলা শৈলশিলা
৫) আরাবল্লি
৬) সমভূমি অঞ্চলে দৃশ্যমান ছোট ছোট বালিয়াড়িকে ভুর বলে।
৭) করাচি, ৮) অক্সানোমিটার
৯) উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার নির্ণয়কারী যন্ত্র
১০) পক্ষী বা পাখি
১১) ই. হেকেল
২২) উট পাখির ডিম
১৩) অ্যাসিটাবুলেরিয়া
১৪) র‍্যামি গাছের বাকলের তন্তু
১৫) শ্বেত রক্ত কণিকার অংশ লিম্ফোসাইট
১৬) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির
১৭) বোরন, মলিবডিনাম, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা।
১৮) নিউক্লিক অ্যাসিডের বিপাকের ফলে
১৯) তামাক গাছের পাতা
২০) মহারাষ্ট্রের বর্ণা নদীর ওপর
২১) নট, ২২) ২১ মার্চ
২৩) আগ্নেয়শিলা
২৪) জিংক অক্সাইড
২৫) জার্মান বিজ্ঞানী হ্যানস স্পিম্যান ও তাঁর ছাত্র ম্যানগোল্ড।

এই সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর আগামী সপ্তাহে

পড়া মনে রাখার কৌশল

ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সব সময় অভিযোগ করে যে, তাদের পড়া মনে রাখতে কষ্ট হয়। অনেক পড়াশোনা করার পরেও পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও স্মরণশক্তি দুর্বলতার জন্য সেসব প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়া হয় না।

মানুষের মস্তিষ্কের দুটি ভাগ। এক ভাগ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, অপরভাগ পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম। সেন্টাল নার্ভাস সিস্টেমের আবার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে, এর সাথে রয়েছে নানা রকম কাজ। তার একটি মেমোরি বা স্মরণশক্তি। পৃথিবীতে বেশি আইকিউ নিয়ে জন্মগ্রহণ কেউ করে না, তাদের ব্যবহারিক আচরণের ওপর নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ। যত চর্চা করা যাবে তত আইকিউ বেড়ে যাবে। তবে সাধারণ আইকিউ ৯০ থেকে ১১০। ৯০-এর নীচে যাদের আইকিউ থাকে তারা সাধারণ অর্থে চলনসই বুদ্ধিমান। বেশির ভাগ লোকজনের আইকিউ ৯০-১১০। আবার কারও আইকিউ ১১০-এর ওপরে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির আইকিউ ১১০-এর উপরে ছিল।

বেশি আইকিউ থাকলে আমরা আবার ঠাট্টা করে পাগল বলি। আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ন্যূনতম ১০ ভাগ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। এটা এই নয় যে, ইচ্ছা করলে ১২ ভাগ ব্যবহার করতে পারব, নির্ভর করে সম্পূর্ণ নানা রকম চর্চার ওপরে। একেক পেশায় এই চর্চা একেক রকম। কারও ডাক্তারি পেশায় আইকিউ ভালো থাকে, ব্যবহারিক চর্চার জন্য সে বিখ্যাত ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ হয়, কারও বিজ্ঞান পেশায় ভালো থাকে ব্যবহারিক চর্চার জন্য সে হয় ভালো বিজ্ঞানী। তেমনি চর্চার ফলেই একজন ছাত্র সাধারণ মান থেকে মেধাবী ছাত্রে উন্নীত হতে পারে। পড়াশোনা ছাড়াও নানা রকম জিনিস আমাদের মনে রাখতে হয় আমাদের জীবনযাত্রায়।

আত্মবিশ্বাস: আত্মবিশ্বাস যে কোনও কাজে সফল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত। মনকে বোঝাতে হবে পড়াশোনা অনেক সহজ বিষয়– আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। তাহলে অনেক কঠিন পড়াটাও সহজ মনে হবে। আত্মবিশ্বাসের মাত্রা আবার কোনও রকমেই বেশি হওয়া চলবে না। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সাথে নিজেকে তুলনা করে চলনসই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোনও বিষয় পড়তে যাওয়া ভালো। একবার পড়েই মনে রাখা কঠিন। তাই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে এর সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করার পরেই মনে রাখা সহজ হয়। আবার কোনও বিষয়ে ভয় ঢুকে গেলে সেটা মনে রাখা বেশ কঠিন। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত অঙ্ক ও ইংরেজিকে বেশি কঠিন মনে করে। তাদের উচিত হবে বইয়ের প্রথম থেকে পড়া বুঝে বুঝে পড়া এবং

পড়ার পাশাপাশি লেখার অভ্যাস করা। লেখাপড়া মনে রাখার একটি বড় পদক্ষেপ। এই জন্যই বলা হয় লেখাপড়া। আর পড়ালেখা করার উত্তম সময় একেকজনের জন্য একেক রকম। যারা সাধারণত হোস্টেলে থাকে তাদের ক্ষেত্রে রাত জেগে পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। অনেকের কাছে আবার বিকেলে বা সন্ধ্যার পরে, কেউ কেউ আবার সকালে পড়তে ভালোবাসে। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যেহেতু ঘুমের পরে মন ও মনন পরিষ্কার থাকে সেহেতু ভোর হচ্ছে পড়াশোনার জন্য ভালো সময়।

কনসেপ্ট ট্রি বা ধারণার গাছ: পড়া মনে রাখার এটি একটি কৌশল। কোনও বিষয়ে পড়া মনে রাখার জন্য সম্পূর্ণ পড়াটি পড়ে নেওয়ার পর সাতটি ভাগে ভাগ করতে হয়। এবং প্রতিটি ভাগের জন্য এক লাইন করে সারমর্ম লিখতে হয়। ফলে পড়ার বিষয়টি সাতটি লাইনে সীমাবদ্ধ থাকে। এর প্রতিটি লাইন একটি পাতায় লিখে অধ্যায় অনুযায়ী একটি গাছ তৈরি করে গাছের নিচ থেকে ধারাবাহিকভাবে পাতার মতো করে সাজাতে হবে। যাতে এক দৃষ্টিতেই পড়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনে পড়ে যায়। এই পাতাগুলোতে চোখ বোলালে লেখাটি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। বাংলা, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞানের জন্য এই কৌশলটি বেশ কার্যকর।

কি-ওয়ার্ড বা মূল শব্দ: যে কোনও বিষয়ের কঠিন অংশগুলো ছন্দের আকারে খুব সহজে মনে রাখা যায়। যেমন— রামধনুর সাত রং মনে রাখার সহজ কৌশল হলো 'বেনীআসহকলা' শব্দটি মনে রাখা। প্রতিটি রঙের প্রথম অক্ষর রয়েছে শব্দটিতে।

ইতিহাস মনে রাখার কৌশল: ইতিহাস মনে রাখায় এই কৌশলটি কাজে দেবে। বইয়ের সব অধ্যায় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিয়ে গত ৪০০ বছরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা বানাতে হবে। সেখান থেকে কে, কখন, কেন উল্লেখযোগ্য ছিলেন, সেটা সাল অনুযায়ী খাতায় লিখতে হবে। প্রতিদিন একবার করে খাতায় চোখ বোলালে খুব সহজে পুরো বই সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হবে। ফলে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন কষ্টকর মনে রাখার বিষয় হলো বিভিন্ন সাল। এগুলোকে কালো রেখার মাধ্যমে চর্চা করে মনে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখানে কনসেপ্ট-ট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা সত্যি যে আলাদা আলাদাভাবে ইতিহাস মনে রাখাটা কষ্টকর বটে।

উচ্চস্বরে পড়া: পড়া মুখস্থ করার সময় উচ্চস্বরে পড়তে হবে। এই পদ্ধতিতে কথাগুলো কানে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে সহজে আয়ত্ত করা যায়। শব্দহীনভাবে লেখাপড়া করলে একসময় পড়ার গতি কমে গিয়ে শেখার আগ্রহ হারিয়ে যায়। আর আগ্রহ না থাকলে পড়ার কিছুক্ষণ পরই তা মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেখা হয়ে যাওয়ার পর বারবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এটাও পড়া মনে রাখায় বেশ সাহায্য করে।

এরপর পরের সপ্তাহে

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

বাংলার লেখিকা

বাংলায় বেশ কিছু মহিলা লেখক শুরু থেকে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার যে অধিকার তা কায়েম রাখতে সমানে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন। এঁরাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের নিজেদের বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান সময় অবধি এঁদের সংখ্যা নেহাত কিছু কম নয়। আজ এঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সম্পর্কে আমরা জানব। যাঁদের সম্পর্কে আজ বলার পরিসর পাওয়া গেল না তাঁরা হলেন রাসসুন্দরী দাসী, আশা দেবী, আশালতা সিংহ, স্বর্ণলতা দেবী, বাণী বসু, নবনীতা দেবসেন, মন্দাক্রান্তা সেন, তসলিমা নাসরিনসহ আরও অনেকে।

রোকেয়া বেগম: ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। কেউ কেউ তাঁকে বাঙালি নারীর 'নবজাগরণের অগ্রদূত' বলেছেন। তাঁর জন্মগত নাম রোকেয়া খাতুন, বৈবাহিক সূত্রে নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

রোকেয়া বেগমের স্বামী ছিলেন খুব উদার ও আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন। তিনি রোকেয়া বেগমকে বিয়ের পর লেখালিখিতে উৎসাহ দেন এবং একটি স্কুল তৈরির জন্য টাকা জমাতে থাকেন। এরপর রোকেয়া বেগম সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামে একটি গল্প লিখে বাংলার সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেন। ১৯০৯ সালে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও কিছুদিন পরে নানান ঝামেলায় সেটি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু রোকেয়া বেগমের প্রচেষ্টায় সেটি পুনরায় চালু হয়ে পরবর্তীতে সেটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। তাঁর সবথেকে জনপ্রিয় রচনা 'Sultanas Dream', বাংলা অনুবাদ সুলতানার স্বপ্ন'। এটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের একটি মাইলস্টোন হিসাবে ধরা হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'মতিচুর'। নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী এইসব পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নারী শিক্ষার প্রসার ও লিঙ্গ সমতার পক্ষে সমর্থন। ধর্মের নামে যে নারীদের প্রতি যে অবিচার হয় তিনি তার বিরোধিতা করেছেন, শিক্ষা এবং পছন্দ অনুযায়ী পেশা নির্বাচনের অধিকার যতদিন পর্যন্ত নারী না পাচ্ছে ততদিন অবধি তাদের মুক্তি সম্ভব না বলে তিনি জানিয়েছেন।

কামিনী রায়: কামিনী রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪-র ১২ অক্টোবর। তিনি সেই ব্রিটিশ আমলের প্রথম মহিলা যিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি বাঙালি কবি, সমাজকর্মী ও নারীবাদী লেখিকা ছিলেন। ১৮৮৬ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর তিনি বেথুন কলেজের স্কুল বিভাগে পড়ানো চালু করেন। তিনি সেই সময় নারী শ্রম তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন।

তিনি মাত্র আট বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন। ১৮৮৯-তে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এই গ্রন্থের লেখিকা হিসাবে তিনি নাম প্রকাশ করেননি কিন্তু কবিতা প্রকাশের পর এর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—'নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত' ও 'অম্বা'। ১৯০৫-এ তিনি শিশুদের জন্য 'গুঞ্জন' নামে একটা কাব্যগ্রন্থ এবং 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ' প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন।

সুখলতা রাও: সুখলতা রাও ১৮৮৬-র ১০ অক্টোবর বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু সেই সময়ের একজন বিখ্যত লেখিকা ছিলেন তাই না তিনি সমাজসেবাও করতেন। তিনি প্রধানত শিশু সাহিত্য বেশি রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হল 'লালিভুলির দেশে', 'নিজে পড় নিজে শেখ', 'গল্প আর গল্প', 'খোকা এল বেড়িয়ে', 'নতুন পড়া', 'সোনার ময়ুর', 'নতুন ছড়া', 'বিদেশী ছড়া', 'নানা দেশের রূপকথা', 'পথের আলো', 'ঈশপের গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প' প্রভৃতি।

লীলা মজুমদার: লীলা মজুমদার ১৯০৮-এ ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পর্ক সূত্রে তিনি সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন এবং সত্যজিৎ রায়ের পিসি। তিনি যেমন প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করে সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেছেন, তেমনই অনেক শিক্ষামুলক রচনার তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন।

১৯২২-এ 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচিত গল্প প্রকাশ পায়। এরপর ১৯৬৩-'৯৪ পর্যন্ত সহসম্পাদক হিসাবে পত্রিকাটিকে চালিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে শরীর ভালো না যাওয়ার কারণে তিনি অবসর নেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'হলদে পাখির পালক', 'টং লিং', 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স', 'সব ভুতুড়ে'। 'পাকদণ্ডি' (আত্মজীবনীমূলক রচনাতে তাঁর শিলং-এ ছোটবেলার স্মৃতি, শান্তিনিকেতনের কথা ও রেডিওর সাথে যুক্ত হয়ে সেই সময়ের কাজকর্মের কথা বর্ননা করেছেন)। তিনি আনন্দ পুরস্কার ও শিশু সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত।

আশাপূর্ণা দেবী: বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব আশাপূর্ণা দেবী। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক এই লেখিকা ১৯০৯-এর ৮ জানুয়ারি কলকাতার পটলডাঙায় মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর রচনা হল এক বিশাল ভাণ্ডার। তাঁর প্রথম রচনা 'বিবাহ'। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে মনে করা হয় 'সুবর্নলতা', 'বকুলকথা'কে। এছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'সাহিত্য জীবনের পাঁচটি পর্ব', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক', 'দিব্যহাসিনীর দিনলিপি', 'আর এক আশাপূর্ণা', 'চিত্রকল্প', 'অগ্নি পরীক্ষা'। এছাড়া আরও যেসব ছোট ও বড় রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে সেগুলি হল 'গজ উকিলের হত্যা রহস্য', 'মজারু মামা', 'যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী', 'ছাড়পত্র', 'ভুতুড়ে কুকুর', 'মধ্যে সমুদ্র', 'যাচাই', 'ভুল ট্রেনে উঠে', 'চশমা পালটে যায়' ইত্যাদি।

দেড় হাজার ছোটগল্পসহ আড়াইশোর বেশি উপন্যাস রচনা করে আশাপূর্ণা দেবী সম্মানিত হন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান, ডক্টরেট সম্মান, পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান অকাদেমি ফেলোশিপ-এ।

প্রতিভা বসু: প্রতিভা বসু ১৯১৫-এ ১৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভারতীয় বাঙালি ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। পারিবারিক পরিচয়ে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী।

প্রতিভা বসুর বেশিরভাগ বই বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছিল। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস সিরিয়ালের আকারে টিভিতে দেখানো হয় এবং সেগুলি ব্যাপক হারে মানুষের মন জয় করে। তিনি লেখার সাথে সাথে গানও করতেন খুব ভালো। ১৯৪২ সালে প্রতিভা বসুর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। এর দু-বছর পর ১৯৪৪-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু পাঠ্য রচনাসহ তিনি একশোর বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'ছোটগল্প' ও 'বৈশাখী' নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'মেঘের পরে মেঘ', 'সমুদ্র হৃদয়', 'বনে যদি ফুটল কুসুম', 'মধ্য রাতের তারা', 'বিবাহিতা স্ত্রী', 'মনের ময়ূর' ইত্যাদি। ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মাধবীর জন্য', 'বিচিত্র হৃদয়'। তাঁর রচিত প্রবন্ধটি হল 'মহাভারতের মহারণ্যে'।

মহাশ্বেতা দেবী: ১৯২৬ সালে মহাশ্বেতা দেবী ঢাকা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১০০টিরও বেশি উপন্যাস ও ২০টির বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি'। ১৯৫৬ সালে এই উপন্যাস রচনার আগে তিনি ঝাঁসিতে গিয়ে উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। এছাড়া তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা হল—'হাজার চুরাশির মা', 'অরণ্যের অধিকার', 'অগ্নিগর্ভ', 'নীড়েতে মেঘ' ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে তিনি বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময় তিনি সাংবাদিকতার সাথে লেখাও চালিয়ে যান পুরোদমে। তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজের ক্ষমতাশালী মানুষদের ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের থেকে সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষেরা যে অত্যাচারের শিকার হতো তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্য অকাদেমি, জ্ঞানপীঠ, পদ্মবিভূষণ এবং বঙ্গবিভূষণ ও আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

পড়াশোনার বিকাশে লাইব্রেরির ভূমিকা

প্রথম পাতার পর

৫০০ বছর আগের কথা। তখন লাইব্রেরিও সকলের কাছে আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। বইকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয় সরকার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অফিস, কাছারি, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমিতি। স্কুল-কলেজে লাইব্রেরির উপস্থিতিতে বোঝা যায় যে বিদ্যালয়ও স্বীকার করে যে পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বইয়ের দরকার ভীষণ। এমনকী বিভিন্ন দেশে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিও আছে। ভেনিজুয়েলায় মমবয় বিশ্ববিদ্যালয় দুটি খচ্চরকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হিসাবে ব্যবহার করে পাহাড়ি গ্রামের মানুষদের বই সরবরাহ করে থাকে, গ্রামের লোকেরা যাকে বলে বিবিলোমুলাস।

ভারতে লাইব্রেরির ইতিহাস অনেক পুরনো। মোগল সাম্রাজ্যে প্রথম লাইব্রেরি তৈরি হয়। সেই লাইব্রেরি ছিল প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এরপরে কিছু পারিবারিক লাইব্রেরিও তৈরি হয়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে পাবলিক লাইব্রেরি তৈরি হয়। পরবর্তীতে বইচর্চা আরও বাড়াতে পাড়ায় পাড়ায় মানুষ দল তৈরি করে লাইব্রেরি বানাতেন। সেখানে ঘরের মেয়ে-বউরাও বই পড়ায় অংশগ্রহণ করতেন। তার সঙ্গে নানারকম পত্রিকা, খবরের কাগজ পাওয়া যেত যা আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সমাজবিজ্ঞানী এঙ্গেলস-এর ভাষায়, পাঠাগার শূন্য রাষ্ট্র যেন শুকিয়ে মরার মতো। দার্শনিক হেগেল মন্তব্য করেছেন, পাঠাগারের মাধ্যমেই জনসমাজ যখন রাষ্ট্রীয় সমাজে রূপান্তরিত হয়, তখনই সে সাবালকত্ব অর্জন করে এবং বিশ্ব সমাজের অংশ হয়ে দাড়ায়। সেকালের ওমর খৈয়াম, একালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলীরও রয়েছে বহু মূল্যবান উক্তি, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ-এ লাইব্রেরির অপরিহার্যতা নিয়ে নানা কথা বলেছেন। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা স্কুল-কলেজের চেয়ে বেশি। তাদের কথার সাথে তাল মিলিয়ে বলতেই হয় মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, যুক্তি-বুদ্ধিতে, সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠনে লাইব্রেরির কোনও বিকল্প নেই। লাইব্রেরি মানুষকে বইমুখী, স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করে তোলে। শুধু কী তাই? আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী বিকশিত হতে, নিত্যদিনের এবং পেশা ও জীবিকা-সংক্রান্ত নানারকম খবর জোগাড়ে এবং বিনোদনের রসদ পেতেও লাইব্রেরির ওপর আমাদের নির্ভর করতেই হয়। কারণ এসব শুধু পাঠ্যবই পড়লে হয় না। অবশ্য আজকাল কাগজে ছাপানো বইয়ের পাশাপাশি অনলাইনেও লাইব্রেরি তৈরি হচ্ছে। দুর্লভ বইগুলোর পাশাপাশি নিত্যনতুন বইও ইন্টারনেটে আপলোড করা হচ্ছে। কেবল বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরিগুলোই নয়, প্রত্যেক দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনলাইন লাইব্রেরি গড়ে তোলা হচ্ছে।

তবে দরকার হল বই পড়ায় নিজের তাগিদ তৈরি করা। কিন্তু ব্যাগ আর হোমওয়ার্ক সামলে কই আর সবাই এসব করতে পারে। কিন্তু একেও আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে ধরতে হবে। এ এমন একটি অভ্যেস তৈরি করবে যে স্কুল জীবন শেষ হওয়ার পরেও বইয়ের সঙ্গে সখ্য শেষ হবে না। ধরাবাঁধা শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পরও শেখার প্রক্রিয়াতে থাকার সুযোগ লাইব্রেরির কারণে ষোলোআনা টিকিয়ে রাখা যায়। জীবনে যে কোনও খারাপ সময়ে একজন বন্ধু হাত ছাড়লেও বই সঙ্গ ছাড়ে না। লাইব্রেরিতেই যার সীমাহীন সম্ভার। যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির দুটি অন্যতম পিলার হল বিদ্যালয় আর লাইব্রেরি। কিন্তু আফসোস হল আজ উন্নতির কাছে এসে সেই লাইব্রেরিকেই আমরা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ২০১৭

TEAM উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
তনুশ্রী দাস | সালমা আহমেদ
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি)
এনায়তি দেবদত্ত (শিলচর)

ভারতের একমাত্র বাংলা দৈনিক যুগশঙ্খ
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে

জেনারেল নলেজ

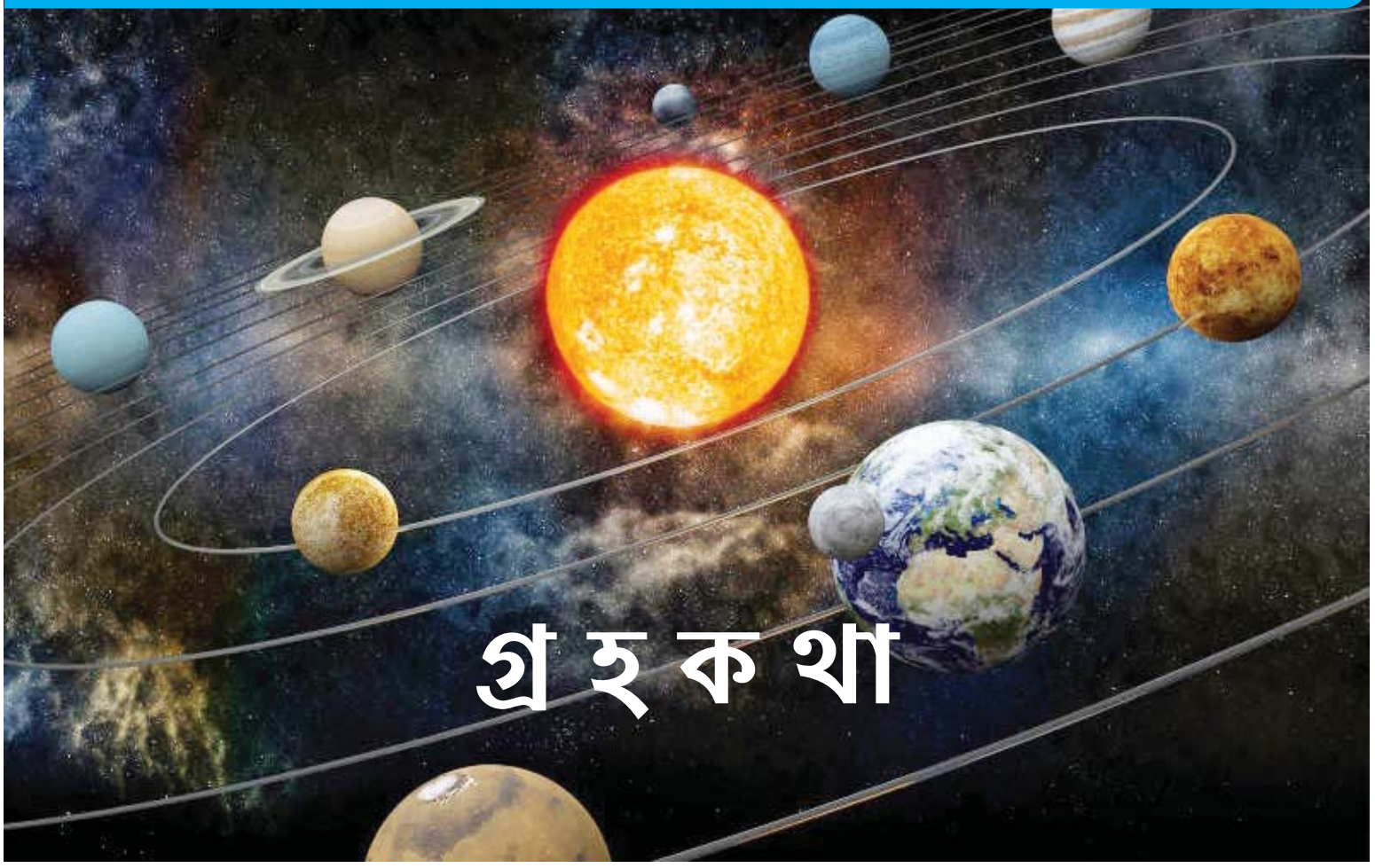

গ্রহকথা

বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯ ভাগ নিয়ে সূর্য তৈরি হয়েছে। বাকি ১ ভাগ নিয়ে সৌরজগতের অন্যান্য সদস্য তৈরি হয়েছে। এদের বেশিরভাগই সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সাধারণভাবে এই সকল সদস্যদের তালিকায় রয়েছে— ছোট-বড় নানা মাপের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু।

সৌরজগতের গ্রহসমূহ

সূর্যকে কেন্দ্র করে যে সকল বিশালাকার মহাকাশীয় গোলক ঘুরে চলেছে, সে সকল গোলককে সাধারণভাবে গ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। সূর্যের কাছ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে এই গ্রহগুলো অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে এখনও নিরূপিত হয় না। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রহের সংজ্ঞানুসারে কিছু গ্রহকে বামনগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সেই বিচারে প্লুটোকে এখন আর প্রধান গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। ছোট-বড় এবং গাঠনিক উপাদান বিচার করে গ্রহগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

পৃথিবীসদৃশ-গ্রহ: সূর্য থেকে পরপর চারটি গ্রহকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই গ্রহগুলোর গাঠনিক উপাদান পাথর ও বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ। এই গ্রহ চারটি হল— বুধ,শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল।

গ্যাসীয় দানব-গ্রহ: মঙ্গল গ্রহের পরে ৪টি বিশালাকার গ্রহ রয়েছে। এই গ্রহ দুটির প্রধান উপাদান জমাটবদ্ধ গ্যাস। এই গ্যাসপিণ্ডের প্রধান অংশ হিসাবে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, অ্যামোনিয়া। এই ৪টি গ্রহ হল— বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

বামন গ্রহ: গ্রহের তৃতীয় সূত্রানুসারে, প্লুটোকে গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে কিনা, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। ২০০৬ সালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রহের সংজ্ঞা নির্ধারিত হলে, প্লুটো প্রধান গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা প্লুটোর যে কক্ষপথ দেখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, চ্যারন/ক্যারন নামক উপগ্রহের প্রভাবে প্লুটো নিজের অক্ষ পরিত্যাগ করে ছোট একটি চক্র তৈরি করে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, আবার একই সাথে নিজের ক্ষুদ্র চক্রের জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্লুটোর এই বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে শুধু প্লুটো নয়, সৌরজগতের প্লুটোর মতো আরও কিছু গ্রহকে নতুন করে নাম দেওয়া হয়, বামন গ্রহ। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সৌরজগতের বামনগ্রহগুলো হলো— এরিস, প্লুটো, হাউমেইয়া। এছাড়া আরও তিনটি গ্রহকে বামনগ্রহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। তবে এগুলো বামনগ্রহ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

সৌরজগতের গ্রহ: উপগ্রহের নামকরণ করে থাকে একটা বিশেষ সংস্থা যার নাম International Astronomical Union (IAU)। সংস্থাটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল গ্রহ-উপগ্রহের নামকরণের জন্য IAU-ই একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা। এদের প্রত্যেক সদস্যই পেশাদার অ্যাস্ট্রোনোমার।

IAU-এর মতে, জ্যোতির্বিদ্যা একটি অতি প্রাচীন বিজ্ঞান এবং এর অনেক নামকরণ আদিকাল থেকে চলে আসছে বা ঐতিহাসিক ভাবে প্রবর্তিত। প্রথম দিকে সৌরজগতের অল্প কিছু গ্রহের প্রাচীন নাম রোমান মিথোলজি বা গ্রিক মিথোলজি থেকে আসে। IAU সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই আমাদের সৌরজগতের বাকি সকল (একমাত্র ব্যতিক্রম পৃথিবী ও চাঁদ) গ্রহ-উপগ্রহের নামগুলোও গ্রিক ও রোমান মিথোলজি থেকেই রেখেছে।

মার্কারি (বুধ): ডানা বিশিষ্ট রোমান দেবতা মার্কারি (Mercury) থেকে এসেছে মার্কারি গ্রহের নাম।

রোমান মার্কারীর গ্রিক নাম হার্মিস (Hermes The God of Travelling, Commerce and Thievery)। হার্মিস হল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভ্রমণের দেবতা। তাকে ঈশ্বরের বার্তাবাহকও বলা হয়ে থাকে। মার্কারি বা হার্মিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রচণ্ড দ্রুত গতি। এই দ্রুত গতির বৈশিষ্ট্যের কারণে বুধ গ্রহের এই মার্কারি নামকরণ। কারণ, বুধ গ্রহ প্রচণ্ড বেগে (সেকেন্ডে ৫৬ কিমি, যেখানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রতি সেকেন্ডে ৩৬ কিমি বেগে) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

ভেনাস (শুক্র): রোমান ভালোবাসার দেবী ভেনাস বা গ্রিক ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির (Aphrodite, The Goddess of love and beauty) নামানুসারে শুক্র গ্রহের নামকরণ করা হয় এর অপার সৌন্দর্যের কারণে। আমাদের সোলার সিস্টেমের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সুন্দর গ্রহ হল শুক্র।

আর্থ (পৃথিবী): Earth শব্দটার নামকরণের তেমন কোনও তাৎপর্যগত মানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রোটো-জার্মানিক (Proto-Germanic) শব্দ Eartho থেকে আর্থ শব্দটার উৎপত্তি।

মার্স (মঙ্গল): রোমান যুদ্ধের দেবতা মার্স (Mars), যার গ্রিক নাম এরিস (Ares The God of War), এর নামে মার্সের নামকরণ করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তাক্ত পরিবেশের মতো লাল হওয়ার কারণে রোমানরা মঙ্গলের এই নামকরণ করেছিল।

জুপিটার (বৃহস্পতি): ফাদার অব দ্য গড অ্যান্ড মেন, অর্থাৎ দেবতা ও মানুষের পিতা রোমান গড জুপিটার।

সবাই তাকে গ্রিক, জিউস (Zeus, The Father of All God and Men, The God of Thunder, The Ruler of Olympia) নামেই বেশি চেনে। জিউসের মতোই প্রচণ্ড এবং বিশাল এই বৃহস্পতি গ্রহ।

বৃহস্পতির (৮৮,৬৯৫ কিমি) ব্যাসার্ধ পৃথিবীর (৬৪০০ কিমি) ব্যাসার্ধের ১১ গুণ। আয়তনে পৃথিবীর ১৩০০ গুণ বড়। বৃহস্পতি এতই বড় যে এর ভর সৌরজগতের সকল গ্রহের সম্মিলিত ভরের আড়াই গুণেরও বেশি। তাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেবতার নামে বৃহস্পতির নামকরণ করায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর নামগুলোও জিউসের সাথে রক্তের সম্পর্কে যুক্ত গ্রিক দেবতা-দেবী (অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক দেবতা) নামে রাখা হয়েছে।

স্যাটার্ন (শনি): জিউস, পোসাইডন, হেইডিস, এবং হেরার পিতা, অতি বিশাল টাইটান ক্রনোস (Cronos, god of farming and the father of Zeus/Jupiter)-এর রোমান নাম স্যাটার্ন থেকে শনি গ্রহের নামকরণ করা হয়। ক্রনোস হল প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, সন্তান ভক্ষণকারী এবং টাইটানদের রাজা। শনির উপগ্রহের নামগুলো সব টাইটাইনদের নামে করা হয় যারা সবাই ক্রনোসের ভাই-বোন।

ইউরেনাস: গ্রিক আকাশের দেবতা ইউরেনাসের নামে ইউরেনাস গ্রহের নামকরণ করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম লেসলি প্রথম ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করার পর এমন একটা রীতি চালু করেন যে সবাই ইউরেনাসের উপগ্রহগুলোকে শেক্সপিয়র এবং আলেকজান্ডার পোপের লেখা বিভিন্ন চরিত্রের নামে নামকরণ করেন।

নেপচুন: নেপচুনকে নামকরণ করা হয়েছে রোমান সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নামে, যার গ্রিক পরিচয় পসাইডন (Poseidon, The God of Sea)। নেপচুনের সব উপগ্রহর নামকরণ করা হয় পসাইডনের আত্মীয়, বন্ধু ও প্রেমিকার নামে।

প্লুটো: প্লুটোকে নাম রাখা হয় মৃত্যু ও পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নামে, যার গ্রিক নাম হেইডিস (Hades. The God of Death and Underworld)। কারণ যথার্থ। প্লুটোর অবস্থান এতই দূরে এবং এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে প্লুটোকে পাতালপুরী/প্রেতলোক মনে করা যেতেই পারে।

ক্যারন (Charon), প্লুটোর একমাত্র উপগ্রহের নামও বেশ ড্রামাটিক। গ্রিক মিথোলজির এক নাবিক এই ক্যারন, যে মৃত্যুর পর নৌকায় করে আত্মা পাতালপুরীতে নিয়ে যায়।